The Dialogue Decalogue
Leonard Swidler

সংলাপের অনুজ্ঞা

আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃআদর্শিক সংলাপের মৌলিক সূত্র

লেনার্দ সুইডলার

সংলাপ হচ্ছে এক ধরনের কথোপকথন যা সংঘটিত হয়ে থাকে কোন প্রচলিত বিষয় নিয়ে এবং এমন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে যাদের বিষয়টি নিয়ে রয়েছে বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী। এই কথোপকথনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী অন্যের কাছথেকে কিছু শিখবে, যে শেখা তার মধ্যে পরিবর্তন আনবে এবং তার বৃদ্ধির সহায়ক হবে। সংলাপের এই সংজ্ঞাটিই সংলাপের প্রথম অনুশাসনটি রূপায়িত করে।

অতীতে ধর্মীয়-আদর্শিক ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বিরোধীদের সঙ্গে, যেমন ক্যাথলিকরা প্রটেস্ট্যান্টদের সঙ্গে, আলোচনায় মিলিত হতাম হয় প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার জন্য, অথবা প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে জানার জন্য যাতে তার বিপক্ষে আরো ফলপ্রসুভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, অথবা অন্তত আরো ভালভাবে চুক্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য। যদিও বা কখনও আমরা একে অপরের মুখোমুখী হতাম সেটা হত কেবল বিরোধিতার জন্য - কখনও খোলাখুলি বিতর্কে জড়িয়ে, কখনও কিছুটা চতুরতার সঙ্গে, কিন্তু মূল লক্ষ্য থাকত প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা; কারণ আমরা স্থির নিশ্চিত ছিলাম যে কেবল আমাদেরই রয়েছে চূড়ান্ত সত্যজ্ঞান।

কিন্তু সংলাপ কখনওই বিতর্ক নয়। সংলাপে একজন অংশগ্রহণকারী অন্য অংশগ্রহনকারীর কথা এমন খোলা ও সহানুভূতিশীল মন নিয়ে শুনবেন যেন তিনি অন্যের অবস্থান বোঝার চেষ্টা সম্যকভাবে এবং যথাসম্ভব আন্তরিকতার সঙ্গে করছেন। এ রকম দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিকভাবে এ অনুমানকে অন্তর্ভূক্ত করে যে কোন একটা সময়ে আমরা দেখব অন্য অংশগ্রহনণকারীর অবস্থান এত প্ররোচক যে আমরা যদি ন্যায়ানুগ আচরণ করি তাহলে আমাদের নিজেদেরকে বদলাতে হবে আর সেই পরিবর্তন হতে পারে আলোড়ণ সৃষ্টিকারী।

আমরা এখানে অবশ্যই একটা বিশেষ ধরনের সংলাপের, আন্তধর্মীয় ও আন্তআদর্শিক সংলাপের কথা বলছি। সে রকম সংলাপ করতে হলে কেবল এটা যথেষ্ট নয় যে অংশগ্রহণকারীরা কোন একটা আন্তঃধর্মীয়-আন্তঃআদর্শিক প্রসঙ্গ নিয়ে, যেমন জীবনের অর্থ কি ও কিভাবে সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করবেন। বরং সংলাপ হতে হবে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা আলোচ্য ধর্মীয় ও আদর্শিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অনুসারী। যেমন আমি যদি খ্রিস্টানও না হই আর মার্ক্সবাদীও না হই তাহলে আমি খ্রিস্টিয়-মার্ক্সবাদী সংলাপে একজন 'অংশিদার' হতে পারব না; যদিও আমি আলোচনা শুনতে পারি, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি এবং কিছু সহায়ক মন্তব্যও করতে পারি।

বলা বাহুল্য, আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃআদর্শিক সংলাপ আমাদের জন্য একটা নতুন বিষয়। আমরা অতীতে সংলাপের ধারণাটাই স্পষ্ট ভাবে করতে পারি নাই, সংলাপ করা তো দূরের কথা। তাহলে আমরা কিভাবে ফলপ্রসুভাবে সংলাপ করতে নিযুক্ত হতে পারব? নিচে আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃআদর্শিক সংলাপের কিছু মৌলিক প্রাথমিক সূত্র বা "অনুজ্ঞা" দেওয়া হল যা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে যদি সত্যিকার অর্থে সংলাপ হতে হয়। এগুলো কোন তাত্বিক নিয়মাবলী নয় অথবা কোন স্বর্গীয় অনুজ্ঞা নয় বরং কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা।

প্রথম অনুজ্ঞা: ***সংলাপের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল শেখা, অর্থাৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এবং বাস্তবতার অনুধাবন, অত:পর সেই অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন।*** ন্যূনতম ভাবে আমি যে সত্যটা শিখেছি সেটা হল আমার সংলাপের অংশিদার 'ওটা'র চেয়ে'এটা'তে বেশী বিশ্বাস করেন, তাঁর প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গীও বদলায় সেই অনুযায়ী; আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আমার মধ্যেকার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন অবশ্যই। আমরা সংলাপে প্রবৃত্ত হই যাতে আমরা শিখি, বদলাই আর বেড়ে উঠি; এজন্য নয় যে আমরা জোর করতে পারি অন্যেদের মধ্যে বদল আনতে, যেমন আশা করা হয় বিতর্ক করে করার - যে আশা বাস্তবায়িত হয় বিপরীত অনুপাতে বারংবার ও প্রচণ্ডতার সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার মাধ্যমে। অন্যদিকে, যেহেতু সংলাপে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী আসেন শেখার ও নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়ে, তাই অপর পক্ষের মধ্যেও পরিবর্তন অবশ্যই আসবে। ফলে বিতর্কের যে উদ্দেশ্য, বরং তার চেয়েও বেশী অর্জিত হয় অনেক বেশী কার্যকরভাবে, সংলাপের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় অনুজ্ঞা: ***আন্ত:ধর্মীয় ও আন্ত:আদর্শিক সংলাপ অবশ্যই হবে একটি দ্বিমুখী প্রকল্প- প্রতিটি ধর্মীয় ও আদর্শিক গোষ্ঠির নিজেদের ভিতরে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও আদর্শিক গোষ্ঠির মধ্যে।*** আন্তধর্মীয় সংলাপের প্রকৃতি 'আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট' ধরণের হওয়ার কারণে এবং যেহেতু সংলাপের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে যে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী শিখবে ও নিজেকে বদলাবে, তাই এটাও জরুরী যে প্রত্যেকে সংলাপে প্রবৃত্ত হবে কেবল তার বিপক্ষীয় মতবাদ পোষণকারীর সঙ্গে নয়, যেমন লুথারিয় মতবাদী এনজিলিয় মতবাদী ব্যক্তির সঙ্গে, বরং নিজের সমগোত্রীয় লুথারিয়ের সঙ্গেও, আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ফসল সহভাগ করার জন্য। কেবল এভাবেই সমগ্র জনগোষ্ঠি অবশেষে শিখবে ও বদলাবে, অগ্রসর হবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্তর্দৃষ্টি বাস্তবায়নের দিকে।

তৃতীয় অনুজ্ঞা: ***প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে সংলাপে আসতে হবে পরিপূর্ণ সততা ও আন্তরিকতা সহকারে।*** এ ব্যাপারটা পরিস্কার করে নেওয়া দরকার যে দিকেই ছোট বা বড় আঘাত....., ভবিষ্যৎ পরিবর্তন যাই হোক না কেন, এবং যদি প্রয়োজন পড়ে, ***অপরদিকে প্রত্যেক অংশগ্রহনকারী ধরে নেবে যে অন্যপক্ষের অংশগ্রহণকারীর মধ্যেও তেমনি পরিপূর্ণ সততা ও আন্তরিকতা রয়েছে।*** আন্তরিকতার অভাব যে কেবল সংলাপ সংঘটিত হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে তাই

নয়, অপর পক্ষের আন্তরিকতা আছে এটা মনে না করাটাও সংলাপ করার পক্ষে ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। আস্থা না থাকলে সংলাপ হবে না।

চতুর্থ অনুজ্ঞা: ***আন্ত:ধর্মীয় ও আন্ত:আদর্শিক সংলাপে আমরা কখনও আমাদের আদর্শের সঙ্গে অপর পক্ষের অনুশীলনের তুলনা করব না,*** বরং করব আমাদের আদর্শের সঙ্গে ওদের আদর্শের, আমাদের অনুশীলনের সঙ্গে ওদের অনুশীলনের।

পঞ্চম অনুজ্ঞা: ***প্রত্যেক অংশগ্রহনকারীর নিজেকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।*** উদাহরণস্বরূপ, কেবল ইহুদি সংজ্ঞা দিতে পারেন যে ইহুদি কাকে বলে। বাকীরা কেবল বর্ণনা করতে পারেন বাইরে থেকে দেখলে কেমন বোধ হয়। তাছাড়া যেহেতু সংলাপ একটি গতিশীল মাধ্যম, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী শিখবেন, বদলাবেন এবং ফলত অবিরাম ভাবে গভীরতর, বিস্তৃততর ও রূপান্তরিত করবেন ইহুদি হিসাবে তাঁর নিজের সংজ্ঞা - স্বজাতীয় ইহুদিদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক সংলাপ বজায় রাখতে যত্নশীল থেকে। এইভাবে এটা বাধ্যতামূলক যে সংলাপে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি সংজ্ঞায়িত করবেন তাঁর নিজের পরম্পরা অনুযায়ী প্রামাণিক সদস্য কাকে বলা যাবে।
বিপরীতক্রমে - যাঁর বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হবে তিনি অবশ্যই সেই ব্যাখ্যার মধ্যে নিজেকে চিনতে পারবেন। এটি আন্তঃধর্মীয় .. (hermeneutics)-এর একটি সুবর্ণ নিয়ম, যা বারবার বলেছেন 'আন্তধর্মীয় সংলাপের প্রেরিত ব্যাক্তি' রাইমানডো পানিককার (Raimundo Panikkar)। বোঝার সুবিধার জন্য প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী স্বাভাবিকভাবেই ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করবেন তিনি কি বুঝেছেন সঙ্গীর বা অপর পক্ষের দেওয়া বক্তব্যের দ্বারা; ঐ ব্যাখ্যায় অবশ্যই অপর পক্ষের নিজেকে চিনতে পারতে হবে, অর্থৎ পরিচিতি স্পষ্ট হতে হবে। 'বিশ্ব ধর্মতত্ত'-এর অধিবক্তা উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ (Wilfred Cantwell Smith) আরো একটু যোগ করে বলেন ঐ ব্যাখ্যা এমন চিন্তাশীল পর্যবেক্ষক দ্বারা প্রমানযোগ্য হতে হবে যারা এর সঙ্গে যুক্ত নন।

ষষ্ঠ অনুজ্ঞা: ***প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে সংলাপে আসতে হবে মতবিরোধের প্রসঙ্গগুলো কোথায় আছে এ বিষয়ে কোন রকম নিশ্চিত ধারণা বিহীন ভাবে।*** প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী কেবল অন্য পক্ষের বক্তব্য খোলা মন ও সহমর্মিতা নিয়ে শুনবেন না বরং চেষ্টা করবেন তার সাথে যথা সম্ভব একমত হতে, নিজের ঐতিহ্যের প্রতি সততা বজায় রেখে। যেখানে তিনি নিজের সততা বজায় রেখে আর অগ্রসর হতে পারবেন না সেখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে প্রকৃত মতবিরোধের প্রসঙ্গ; বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলো অনেকটাই ভিন্ন হয় সে সব প্রসঙ্গ থেকে যেগুলোকে আগে ভুলভাবে বিরোধপূর্ণ বলে ধারণা করা হয়েছিল।

সপ্তম অনুজ্ঞা: *সংলাপ হতে পারে কেবল সমকক্ষের মধ্যে, অথবা* যেমন বলেছিলেন ভাটিকান II, ***পার কাম পারি (per cum pari)-র মধ্যে*** । দুজনকেই আসতে হবে একে অপরের কাছ থেকে শেখার জন্য । সুতরাং, যদি, উদাহরণ স্বরূপ, মুসলমান মনে করেন হিন্দুরা নিকৃষ্টতর, অথবা হিন্দু মনে করেন মুসলমানরা নিকৃষ্টতর তাহলে সেখানে কোন সংলাপ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয় । যদি মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে প্রকৃত আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃআদর্শিক সংলাপ হতে হয় তাহলে মুসলমান ও হিন্দু উভয়কেই আসতে হবে প্রধানত একে অপরের কাছ থেকে শেখার জন্য; কেবল তখনই সেটা হবে 'সমানের সাথে সমানের', *পার কাম পারি* । এই নীতি এটাও নির্দেশ করে যে একমুখী সংলাপ বলে কিছু হতে পারে না । যেমন উদাহরণস্বরূপ, ইহুদি-খ্রিস্টিয় যে আলোচনা শুরু হয়েছিল ১৯৬০ সালে সেগুলো ছিল আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃআদর্শিক সংলাপের জন্য কেবল উপক্রমণিকা । বোঝা যায় এবং সঠিকভাবে বললে বলা যায় ইহুদিরা এইসব আলোচনায় এসেছিল কেবল খ্রিস্টানদের শেখাতে, যদিও খ্রিস্টানরা এসেছিল প্রধানত শিখতে । কিন্তু ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যদি প্রকৃত আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃআদর্শিক সংলাপ হতে হয়, তাহলে ইহুদিদেরকেও আসতে হবে প্রধানত শিখবার জন্য; তাহলেই কেবল সেটি হবে *পার কাম পারি* ।

অষ্টম অনুজ্ঞা: ***সংলাপ অনুষ্ঠিত হতে পারে কেবল পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে*** । যদিও আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃআদর্শিক সংলাপ হতে হবে এক ধরণের 'আইন দ্বারা গঠিত' মাত্রা অনুযায়ী, অর্থাৎ অংশগ্রহণকারীরা আসবেন কোন ধর্মীয় বা আদর্শিক সমাজের সদস্য হিসাবে - উদাহরণস্বরূপ, মার্ক্সবাদী বা তাওবাদী - এটাও মৌলিকভাবে সত্য যে 'ব্যক্তি'ই কেবল সংলাপে প্রবৃত্ত হতে পারেন । কিন্তু ব্যক্তিদের মধ্যে সংলাপ গড়ে উঠতে পারে কেবল মাত্র ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে । সে জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে যেন শুরুতেই সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলো নিয়ে যুঝতে না যাওয়া হয়; বরং প্রথমে অগ্রসর হওয়া উচিত সেই সব প্রসঙ্গ নিয়ে যেগুলো কিছু সমভিত্তির জোগান দিতে পারবে, সেই সূত্রে তৈরী করবে মানবিক বিশ্বাসের ভিত্তি । তারপর, ধীরে ধীরে, যেমন যেমন এই ব্যক্তিগত বিশ্বাস প্রগাঢ় ও প্রব্যপ্ত হতে থাকবে, অধিকতর পীড়াদায়ক বিষয়গুলো আলোচনার জন্য গ্রহণ করা যেতে পারবে । এই ভাবে, যেমন শিখনের ক্ষেত্রে আমরা জানা থেকে অজানার দিকে যাই, তেমনি সংলাপে আমরা অগ্রসর হই প্রচলিত সাধারণভাবে বৈরীতা পোষণ করা বিষয় দিয়ে শুরু করে - বিষয়গুলো যে বহু শতকের বৈরীতার ফসলজাত আমাদের পারস্পরিক অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত তা স্বীকার করে নিয়ে, সেগুলো পুরোপুরি ভাবে খুঁজে বের করতে আমাদের বেশ কিছুটা সময় লাগবে - আলোচনা করি কঠিন বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ ।

নবম অনুজ্ঞা: ***ব্যাক্তিবর্গ যাঁরা আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃআদর্শিক সংলাপে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদেরকে অবশ্যই অন্তত ন্যূনতম আত্ম-সমালোচক হতে হবে, নিজেদের ও তাঁদের নিজেদের ধর্মীয় ও আদর্শিক ঐতিহ্য -এই দুয়ের বিষয়েই*** । সে রকম আত্ম-সমালোচনার অভাব ইঙ্গিত করে এই মনোভাবের যে তার নিজস্ব ঐতিহ্যের কাছে রয়েছে সমস্ত সঠিক উত্তর । এই রকম একটা দৃষ্টিভঙ্গী

সংলাপকে না কেবল অপ্রয়োজনীয় করে ফেলে, বরং অসম্ভবও করে ফেলে, কারণ আমরা তো সংলাপে প্রবৃত্ত হই যাতে আমরা কিছু শিখতে পারি- যা অবশ্যই অসম্ভব হয় যদি আমরা মনে করি যে আমাদের ধর্ম কখনও কোন ভুল পদক্ষেপ রাখে নাই - যদি মনে করি যে এতে আছে সমস্ত সঠিক উত্তর। এটা নিশ্চিত যে আন্তধর্মীয় ও আন্তআদর্শিক সংলাপে ব্যাক্তিকে অবশ্যই অবস্থান নিতে হবে নিজের ধর্মীয় ও আদর্শিক পরম্পরার মধ্যে ন্যায়পরতা ও দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, কিন্তু সেই ন্যায়পরতা ও দৃঢ় বিশ্বাস অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করবে, বাদ দেবে না একটা স্বাস্থ্যকর আত্ম-সমালোচনা। এটা ছাড়া কোন সংলাপ হতে পারবে না - এবং অবশ্যই হবে না কোন ন্যায়পরতা।

দশম অনুজ্ঞা: ***প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী চূড়ান্ত পর্যায়ে অবশ্যই চেষ্টা করবেন অন্যপক্ষের ধর্ম বা মতাদর্শ 'ভিতর থেকে' অনুভব করার ;*** কারণ একটি ধর্ম বা মতাদর্শ কেবল মস্তিষ্কের ব্যাপার নয়, এটা চেতনার, হৃদয়ের ও 'সমগ্র সত্তার', ব্যক্তির এবং সম্প্রদায়ের-ও ব্যাপার। জন ডানে (John Dunne) এক্ষেত্রে বলেন "অবস্থান্তরিত হয়ে যাওয়া" অন্যের ধর্মীয় অথবা আদর্শিক অভিজ্ঞতায় এবং তারপরে ফিরে আসা আলোকিত, প্রসারিত ও গভীরতর হয়ে। যেমন রাইমান্ডো পানিককার মন্তব্য করেন, "একটা ধর্ম কি বলে সেটা জানতে হলে আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে সেই ধর্ম কি বলে, কিন্তু তার জন্য আমাদেরকে কোন না কোন ভাবে বিশ্বাস করতে হবে সেট যা বলে তাতে": যেমন, "একজন খ্রিস্টান কখনওই পুরোপুরি ভাবে হিন্দুধর্ম কি তা বুঝবেন না যদি না তিনি, কোন না কোন ভাবে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত না হন। একজন হিন্দুও কখনওই পুরোপুরি ভাবে খ্রিস্টধর্ম কি তা বুঝবেন না যদি না তিনি, কোন না কোন ভাবে খ্রিস্টান না হয়ে যান।"

আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃআদর্শিক সংলাপ তিনটি ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে: ব্যবহারিক, যেখানে আমরা সহযোগিতা করি মানবতার সাহায্যের জন্য; গভীর অনুভূতি বা 'আধ্যাত্মিক' মাত্রা, যেখানে আমরা চেষ্টা করি অন্য পক্ষের ধর্ম বা আদর্শ সম্বন্ধে 'ভেতর থেকে' অভিজ্ঞ হবার; জ্ঞানগত, যেখানে অমরা চাই উপলব্ধি ও সত্য। আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃআদর্শিক সংলাপের তিনটি পর্যায়ও রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে আমরা একে অপরের সম্বন্ধে শেখা ভুল তথ্যগুলোকে ভুলে যাই এবং পরস্পরকে জানতে শুরু করি আমাদের প্রকৃত রূপে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা বাইরে থেকে বোঝার চেষ্টা করি অপর পক্ষের ধর্মের মূল্যবোধগুলোকে এবং আশা করি সেগুলো আমাদের নিজেদের ঐতিহ্যের মধ্যে আত্মিকৃত করার। যেমন, বৌদ্ধ-খ্রিস্ট্রিয় সংলাপে খ্রিস্টানগন অধিকতর উপলব্ধি নিয়ে শিখবেন বৌদ্ধদের ধ্যানগত ঐতিহ্যকে এবং বৌদ্ধগণ শিখবেন অধিকতর মূল্য দিতে ধর্মপ্রবর্তক সম্বন্ধীয়, সামাজিক ন্যায়পরতা সম্বন্ধীয় ঐতিহ্য - উভয় মূল্যবোধই ঐতিহ্যগতভাবে ও জোরালোভাবে, যদিও একচেটিয়াভাবে নয়, অন্যপক্ষের লোকসমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদি আমরা আন্তরিক, অধ্যবসায়ী ও সংবেদনশীল হই সংলাপে, তাহলে আমরা হয়তো তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারব। এখানে আমরা একত্রে শুরু করতে পারব বাস্তবতার, অর্থময়তরা ও সত্যের নতুন ক্ষেত্রসমূহ আবিষ্কার করতে, যেগুলো সম্বন্ধে আমাদের কেউই পূর্বে সচেতন ছিলাম না। এই নতুন বাস্তবতার মাত্রার, যা এ পর্যন্ত আমাদের কাছে অজানা ছিল, আমরা মুখোমুখি হতে পেরেছি কেবল সংলাপে উপস্থাপিত

প্রশ্ন, অন্তর্দৃষ্টি ও নিরীক্ষার কারণে। আমরা এতদূর পর্যন্ত সাহস করে বলতে পারি যে ধৈর্য ধরে চালিয়ে যাওয়া সংলাপ একটা অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে নতুন 'প্রত্যাদেশের', সত্যের অধিকতর 'প্রকাশিত হওয়ার'- যার ভিত্তিতে পরে আমাদেরকে কাজ করতে হবে।

এক ধরনের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে একদিকে প্রথম পর্যায় ও অন্যদিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ব্যাপারে। পরের দুটোতে আমরা কেবল আরেকটা 'সত্য' বা মূল্যবোধ অপর পক্ষের ঐতিহ্য থেকে নিয়ে পরিমানগতভাবে আমাদের ঐতহ্যে যোগ করি না। বরং, যেভাবে আমরা সেটাকে আমাদের নিজস্ব ধর্মীয় আত্ম-উপলব্ধির মধ্যে গ্রহণ করি, সমানুপাতিকভাবে সেটা আমাদের আত্ম-উপলব্ধির রূপান্তর ঘটাতে পারবে। যেহেতু আমাদের সংলাপের অংশীদার একই ধরনের অবস্থানে থাকবেন, আমরা তখন প্রত্যক্ষ করতে পারব প্রকৃতভাবে আমাদের নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের গভীর মূল্যমানসমৃদ্ধ সেইসব উপাদান যেগুলো আমাদের অংশীদারের ঐতিহ্য হয়তো ভালভাবে আত্তীকরণ ঘটাতে পারবে আত্ম-রূপান্তরের উপকারসহ। এই সমস্ত কিছু অবশ্যই করতে হবে উভয় পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ন্যয়পরতার সঙ্গে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর নিজস্ব ধর্মের অপরিহার্য মূলের প্রতি প্রামাণিক ভাবে সৎ থেকে। যাইহোক, সংলাপের প্রভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পন্থাতেই ঐ সব অপরিহার্য মূল্যবোধের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা লাভ করা হবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে; কিন্তু, যদি সংলাপ এগিয়ে নেওয়া হয় ন্যায়পরতা ও অপকটতা, এই দুটোর সাথেই, তাহলে ফলাফল হবে এরকম যে, উদাহরণস্বরূপ, ইহুদি প্রকৃত অর্থেই ইহুদি থাকবেন এবং খ্রিস্টান প্রকৃত অর্থেই খ্রিস্টান থাকবেন, ইহুদিবাদ অথবা খ্রিস্টবাদ সুগভীরভাবে 'বৌদ্ধ' হয়ে গেছে তা সত্ত্বেও নয়, বরং তার কারণেই। এবং এটা একইভাবে সত্য ইহুদিয়কৃত অথবা খ্রিস্টিয়কৃত বৌদ্ধধর্মের জন্য। এখানে সমসুরবর্তী করার কোন কথা চলবে না, কারণ সমবর্তী করার অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মের বিবিধ উপাদানকে মিশ্রিতকরণের মাধ্যমে কোন একধরনের দ্রবণসমগ্রে পরিণত করা, বিবেচ্য ধর্মগুলোর অখন্ডতার প্রতি কোনরকম উদ্বেগ বা সংশ্লিষ্টতা ছাড়া - যা একটি প্রকৃত সংলাপের ক্ষেত্রে হতে পারে না।

অনুবাদ:
ড. কাজী নূরুল ইসলাম
অধ্যাপক
বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়